শিশু-কিশোরদের জন্য

মহান আল্লাহর পরিচয়

গোলাম রেযা হায়দারী আবহুরী
অনুবাদ : আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

সাদৃশ্যহীন অস্তিত্ব

'তাঁর কোন তুলনা ও সাদৃশ্য নেই।'- (সূরা শুরা, আয়াত নং ১১)

আল্লাহ কিসের মতো?

কেউ কেউ মনে করে যে, আল্লাহ বুঝি একটি পাখির মতো, যে তারাগুলোর ঐ পারে উড়ে যায়।

আবার কেউ কেউ মনে করে যে, আল্লাহ হলেন সূর্যের মতো, যা দুনিয়ার ঐ পাশে অবস্থান করে।

কেউ কেউ আবার আল্লাহকে সাদা দাড়ির এক বৃদ্ধ লোকের সাথে তুলনা করে থাকে, যাঁর আকাশে বিশাল বড় একটি বাড়ি রয়েছে।

কিন্তু তোমার জানা দরকার যে, এ সমস্ত চিন্তার কোনোটাই সঠিক নয়। আল্লাহর কোনো তুলনা কিংবা সাদৃশ্য নেই। জগতের কোন জিনিসের সাথে তাঁকে তুলনা করা যায় না। কারণ, তিনি এসব কিছুরই উর্ধ্বে। আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র কুরআনে বলেছেন : 'তাঁর কোনো তুলনা ও সাদৃশ্য নেই।'

যখন কেউ আল্লাহকে দেখে নি এবং ভবিষ্যতেও কোনো দিন দেখতে পাবে না তা হলে এটা কীভাবে বলা যায় যে, তিনি দৃশ্যমান জিনিসগুলোর মধ্যে কোনটির মতো?

আমরা অনেক জিনিসকে একে অপরের সাথে তুলনা করে থাকি। যেমন আমরা বলি : বাই সাইকেলের চাকা দুটি মানুষের দুটি পায়ের মতো ; বৈদ্যুতিক বাল্বটি সূর্যের মতো; আমাদের মাথার উপরে যে মেঘটি রয়েছে সেটা ঠিক খরগোশের মতো;

আমার শিক্ষকের বাড়িটি আমার কাছে ঠিক আমার মায়ের মতো আর স্বয়ং শিক্ষক আমার কাছে ঠিক আমার পিতার মতো।

কিন্তু মহান আল্লাহ যিনি গোটা বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কোনো জিনিস কিংবা কোনো ব্যক্তির মতো নন। আমরা যদি বলি যে, আল্লাহ হলেন সূর্যের মতো কিংবা পর্বত অথবা অন্য কিছুর মতো, তা হলে আমরা তাঁকে ছোট করে থাকি। আল্লাহ এ সবকিছু থেকে বড় এবং শক্তিমান।

আমরা যে আল্লাহকে চিনি, তিনি হলেন দয়াশীল, দানশীল, ক্ষমাশীল এবং ক্ষমতাবান। কিন্তু তাই বলে তিনি তুমি যা কিছু দেখতে পাও সে সবের কোনোটার মতো নন। তাঁর কোনো উপমা বা উদাহরণ নেই। তুমি যা কিছুই দেখতে পাও সবই তাঁরই সৃষ্টি এবং তাঁরই অস্তিত্বের নিদর্শন বহন করে। আর আল্লাহ সে সবের কোনোটার সদৃশ নন।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিলে ভালো হয়, যা অনেকেই জিজ্ঞেস করে থাকে। অনেকে প্রশ্ন করে, 'আল্লাহ পুরুষ নাকি নারী?' তবে এতক্ষণ তোমাদের সাথে যেসব বিষয়ে আলোচনা করেছি তার আলোকে এ প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই দিতে পারবে। কেননা, আমি বলেছি যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি করা কোন জিনিসের মতোই নন। কাজেই পুরুষ হওয়া কিংবা নারী হওয়াটা তাঁর ক্ষেত্রে কোনোই অর্থ হয় না। মানুষ পুরুষ ও নারী এ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। আর আল্লাহ হলেন মানুষের থেকে উর্ধ্বে। কাজেই তাঁর সম্পর্কে এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, তিনি পুরুষ নাকি নারী।

সূরা 'ইখলাস' এর মধ্যে এসেছে : 'আল্লাহর কোনো সমকক্ষ নেই।' অর্থাৎ স্ত্রীর অধিকারী থাকা বা কারো সাথে তুল্য হওয়া বা কারো সদৃশ হওয়া ইত্যাদি কোনো কিছুই না। দুই পা থাকা, হাত থাকা, ভয় করা, ঘাম পড়া, সন্তান হওয়া, পিতা হওয়া, মা হওয়া, স্ত্রী হওয়া, পুরুষ হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো তো মানুষের বৈশিষ্ট্য। কাজেই এটা মনে করা উচিত নয় যে, আল্লাহরও এসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কারণ, তিনি আমাদের মতো নন। তিনি হলেন দৃষ্টান্তহীন এক অস্তিত্ব। তিনি পুরুষও নন, নারীও নন। তিনি হলেন এক অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ। যিনি কোনো কিছুর মতো নন।

যদি চাও তা হলে এ উত্তরটি একটি কবিতার মাধ্যমে শেষ করতে পারি :

গেলাম সাগরের পারে এবং বললাম : বল তো কে আল্লাহ?
সাগর আমার কানে কানে বললো: আল্লাহর মতো নহে তো কেউ
তিনি হলেন মহান স্রষ্টা পাহাড়, গাছপালা আর সাগরের,
মহাজ্ঞানী, পূত পবিত্র সুন্দর তিনি দানশীল ও মহা শক্তিমান বটে।

শিশুদের পিতা নন, কিন্তু তাদের জন্য
সৃষ্টি করেছেন পিতা ও মাতাদের।

ছড়া-কবিতা

স্বাধীনতা এলে তুমি
আ. শ. ম. বাবর আলী

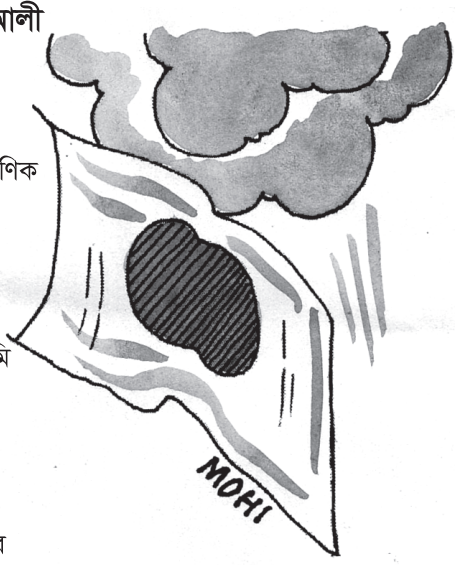

স্বাধীনতা এলে তুমি
সব মানুষের জন্য
তুমি যে গো মুক্তো-মাণিক
নয় তো সহজ পণ্য।

স্বাধীনতা তুমি যে গো
সৎ মানুষের সঙ্গী,
পথিকেরই পথ যে তুমি
শিশুর নাচার ভঙ্গি।

স্বাধীনতা তুমি দিলে
সবার সুখের তথ্য,
তুমি যে গো বন্ধু সবার
সূর্যসম সত্য।

স্বাধীনতা তোমার জন্য
বুকভরা মোর গর্ব।
তুমি আমার সুখ-বিছানা
আমার জীবন পর্ব।

বই আমার জ্ঞানের আকর
মুহাম্মদ ইসমাঈল

বই আমার জ্ঞানের আকর
বই আমার সাথি
বই আমার আঁধার রাতে
আলোয় ভরা বাতি।

বই আমার খেলার সাথি
বই আমার পড়া,
বই আমার জীবন পথের
মুক্তো-মানিক ছড়া।

বই আমার নিত্য-প্রীতি
ভালোবাসার নদী
বই আমার আপন ঘরে
স্বপন নিরবধি।

বই আমার দুঃখ দিনের
ভুলে থাকার সাথি
বই আমার মান অভিমান
জীবন চলার গতি।

বই আমার বন-বনানী
জ্ঞানের ভরা বাসা
বই আমার প্রিয় সাথি
মিটায় মনের আশা।

সব কিছু তার মা
বোরহান মাসুদ

আলোকসোনা চাঁদের কণা মিষ্টি চাঁদের মুখ
যখন হাসে খুশির ছটায় উছলে ওঠে সুখ।
ছুটোছুটি লাফালাফি খেলায় মজা পায়
ছুটবে যখন তখন তাকে ধরাই বুঝি দায়।

মা মনিটা যখন রাগে, একটু অভিমানে
থুম ধরে সেই থাকবে বসে চায় না বামে ডানে।
একটু পরেই লাফিয়ে ওঠে টিভির রিমোট পেয়ে
মা ডেকে কয় আলোকসোনা নাও না বাবা খেয়ে।

আলোক বলে, নেই খিদে মা এই তো খেলাম ডিম
ভাত খাবে না, খুব খুশি সে পেলেই আইসক্রিম।
হঠাৎ করে ঘুমিয়ে গেলে দুধের বাটি পাশে
মুখটি ভেঙে মাকে দেখে মিটমিটিয়ে হাসে।

বোনটি যদি একটু বকে চোখের জলে ভাসে
রাত্রি হলে ঘুমায় গিয়ে মা মনিটার পাশে।
মা-ই যে তার সোনা-রূপা, সব কিছু তার মা;
মা ছাড়া সে এই জগতে কিছুই বোঝে না।

এই দেশে
ইয়াকুব আলী রণী

এই দেশে জন্ম আমার
এই দেশে থাকি,
এই দেশকে নিয়ে আমি
রঙিন স্বপ্ন আঁকি।

সব দেশের থেকে সেরা
আমার এই দেশ
সুখে আছি সবে মিলে
নেই কষ্ট-ক্লেশ।

দেশের নাম ছড়িয়ে আছে
এই ভুবন জুড়ে,
যেথায় যাই সেথায় দেখি
এই পতাকা উড়ে।

এই দেশে জন্ম হয়ে
হলাম আমি ধন্য,
লক্ষ কোটি সালাম আমার
এই দেশের জন্য।

মাছ শিকারি বালক

মাহদী অযার ইয়াযদী
অনুবাদ : কামাল মাহমুদ

সে অনেক দিন আগের কথা। একটি কালো দরিদ্র ছেলে যার কয়েকজন ছোট ভাই-বোন আছে– যার পিতা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং মা গৃহকর্ম ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না। সারাদিন সে সমুদ্রপারে মাছ শিকার করেই জীবন চালাতো।

ছেলেটি খুবই চতুর এবং বুদ্ধিমান। সে কোন প্রকার খেলাধুলার ফুরসত পেত না, সারাক্ষণ সমুদ্র তীরে ছোটাছুটি করতো যাতে বেশি পরিমাণ মাছ শিকার করতে পারে। সমুদ্র তীরে অন্যান্য শিশু-কিশোর যখন খেলাধুলা করতো সে সময় সে মাছ ধরার জন্য ছোট জাল ফেলতো আর মাছের জন্য অপেক্ষা করতো। এ সময় সে বিষণ্ন আর চুপচাপ ও চিন্তামগ্ন হয়ে বসে থাকতো। কোন প্রকার নড়াচড়া করতো না।

প্রত্যেক দিন চিন্তা করতো যে, 'আজ যদি বেশি মাছ পাই তা হলে আগামী কাল একটু বিশ্রাম নিতে পারবো'। কিন্তু সব সময়ই সে কম মাছ পেতো আর তা থেকে যা আয় হতো তার কোন কিছুই আগামী কালের জন্য অবশিষ্ট থাকতো না। ছেলেটি কিশোর। তার আরো ছয় ভাই-বোন রয়েছে। আট সদস্যবিশিষ্ট সংসারের খরচ অনেক। ছেলেটার শুধু সান্ত্বনা ছিলো যে, সে সংসারের বড় ছেলে আর সংসারের সবাই তাকে অভিভাবক হিসেবে মেনে চলতো।

এভাবে চলতে থাকলো। একদিন সুলতান মাহমুদ তাঁর সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে সমুদ্র তীরে ভ্রমণে বের হলেন। তিনি বিশ্রামের পরে সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ার জন্য একাকী ঘোড়ায় চড়ে সমুদ্র তীরে বেরিয়ে পড়লেন। আবহাওয়া ছিলো বেশ চমৎকার। সমুদ্র ছিলো শান্ত। সমুদ্র তীরে অসংখ্য মানুষ যে যার কাজে মশগুল ছিলো। শিশুরা দলে দলে নিজেদের মতো খেলা করছিলো। কিছু লোক সমুদ্রে স্নানরত ছিলো। কেউবা সমুদ্র তীরে বসে রৌদ্রতাপ উপভোগ করছিলো। সুলতান মাহমুদ এসব দেখতে দেখতে অগ্রসর হচ্ছিলেন। যেতে যেতে তিনি ঐ বালকটির নিকটে পৌঁছলেন যে লোকজনের কোলাহল থেকে অনেক দূরে একাকী সমুদ্র তীরে নিরিবিলি একটি জায়গায় বসেছিলো। তাকে দেখে মনে হয়েছিলো, তার নিজের কাজ ছাড়া আর কোন দিকে তার মনোযোগ নেই।

সমুদ্র তীরে চলার কারণে ঘোড়ার পায়ে কোন আওয়াজ হচ্ছিলো না। সুলতান মাহমুদ ছেলেটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছু সময় তাকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তাঁর কাছে মনে হলো ছেলেটি নিজ কাজে রত আছে এবং আপন মনে গুনগুন করে গান গাইছে। সুলতান মাহমুদ সেটা শোনার চেষ্টা করলেন। ছেলেটি বিড় বিড় করে গাইছে–

আমার হৃদয় মোরগের ভাঙা পালকের মতো
ঐ নৌকার মতো সমুদ্রের তীরেই যা স্থির হয়ে আছে
লোকে বলে– বাদ্যযন্ত্রে সুর তোলো
যখনই সুর তুলতে যাই-
বাদ্যযন্ত্রের তারগুলো কিভাবে যেন পেঁচিয়ে যায়।

সুলতান মাহমুদ বুঝতে পারলেন, ছেলেটি দুঃখ-ভারাক্রান্ত এবং মনে মনে ক্ষুব্ধ। তিনি ছেলেটার কথায় কিছুটা প্রভাবিত হলেন এবং উপলব্ধি করলেন যে, ছেলেটাকে সান্ত্বনা দেয়া প্রয়োজন। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বালকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : 'হে প্রিয় বৎস! তুমি এই সমুদ্রের এক কোণে একাকী বসে কী করছো ?'

ছেলেটি ঘুরে তাকিয়ে সুলতান মাহমুদকে রাজকীয় পোশাক ও বেশ-ভূষায় দেখতে পেয়ে বুঝতে পারলো তিনি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যক্তি হবেন। সুলতান মাহমুদকে সালাম দিয়ে বললো : 'মাছ শিকারের চেষ্টা করছি। এটাই আমার কাজ। কোন সময়ই অন্যদের মতো খেলা করতে পারি না। অন্যদের সাথে আমার অনেক পার্থক্য রয়েছে।'

ছেলেটি এক বাক্যে তার সব বেদনার কথা ফুটিয়ে তুললো। সে বললো, সে অন্যদের থেকে আলাদা। যে সব সময় শুধু কাজ করে, যার বাচ্চাদের সাথে খেলতে যাবার মতো অবসর নেই। সুলতান মাহমুদ বললেন : 'খেলা করা তো দোষের কিছু নয়। মানুষ তো নিজে নিজেও খেলা করতে পারে।'

ছেলেটি বললো : 'আমাকে আমার মা আর ছোট ছোট ভাই-বোনসহ মোট সাত জন মানুষের আহার যোগাড় করতে হয়। কেননা, আমার বাবা এ সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন।' সুলতান মাহমুদ বললেন : 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তুমি প্রতি দিন কী পরিমাণ মাছ শিকার করো?'

ছেলেটি বললো : 'এই একেক দিন একেক রকম। কোনো দিন বেশি, কোনো দিন কম। যেদিন যা ভাগ্যে থাকে তাই পাই। তবুও আমি ভিক্ষা করতে চাই না বা কারো কাছে বোঝা হতে চাই না।'

সুলতান মাহমুদ বললেন : 'চমৎকার! শাবাশ! তুমি তো খাঁটি মানুষ।' সুলতান মাহমুদ কোনো না কোনো উছিলায় বালকটিকে সাহায্য করতে চাইছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন : 'এখন একটা কাজ করো। আজ আমি তোমাকে মাছ ধরায় সাহায্য করছি। আজ আমরা যে মাছ পাবো দু'জনে ভাগ করে নেবো।'

ছেলেটা একাকী ক্লান্ত ছিলো। এ রকম সম্ভ্রান্ত একজন মেহমান এবং তাকে সহমর্মী হতে দেখে বললো : 'ঠিক আছে, আমি রাজি। তবে শর্ত হলো– আজকে যে মাছ ধরা পড়বে তা ইনসাফ মতো ভাগ করে দিতে হবে। আপনি কিন্তু ভাগের চেয়ে বেশি নিতে পারবেন না।'

মাহমুদ বললেন : 'না, আমি এমনটা করবো না। বখশিশ বা দয়া দেখানো ঠিক হবে না। আমি কোনো অবস্থায়ই কারো মাল নেই না। আল্লাহর রহমতে আমরা আজকে যে মাছ পাবো তার অর্ধেক তোমার, অর্ধেক আমার।'

সুলতান মাহমুদ বুদ্ধিমান ছেলেটির কথায় খুশি হলেন এবং তার শর্ত মেনে নিয়ে ঘোড়াটিকে একটি পাথরের সাথে বেঁধে ছেলেটির সাহায্যে পাশে এসে বললেন : 'এখন জালে যদি মাছ পড়ে থাকে তা হলে সেটা তোমার। এরপর আবার জাল ফেলবো

এবং নতুন ভাবে গণনা আরম্ভ করবো।' ছেলেটি জাল টেনে উপরে তুললো, কিন্তু তার মধ্যে কোনো মাছ ছিলো না।

সুলতান বললেন : 'মনে হয় এখানে মাছ কম। ওখানে একটু বেশি গভীর। ওখানে বেশি মাছ থাকতে পারে।' ছেলেটির হাত থেকে জাল নিয়ে একটু দূরে গভীর জলে জাল ফেললেন। জালের রশির মাথা বালকটির হাতে দিয়ে বললেন : 'তুমি এখানে বসো। এরপর সাগরের সৈকত থেকে এক মুষ্ঠি বালি নিয়ে পানির মধ্যে ছুঁড়ে মারলেন এবং বালকটির নিকট এসে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন এবং মাছের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। বালকটির জীবন সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন এবং পছন্দের গান, কবিতা, গল্প শোনালেন। কয়েকটি হাসির গল্পও বললেন। এতে বিষণ্ন ছেলেটি কিছুটা খুশি হলো এবং তার মলিন চেহারা ঝলমল করে উঠলো।

এর কিছুক্ষণ পর সুলতান মাহমুদ বললেন : 'এখন জাল টেনে দেখি কী পরিমাণ মাছ ধরা পড়েছে!' জাল টেনে দেখা গেলো জাল মাছে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। ছেলেটি খুশি হয়ে বললো : 'আল্লাহর শোকর। শত শত মাছ ধরা পড়েছে। আমি কখনোই এত মাছ ধরতে পারি নি। সব সময় দুই, তিন, চারটা করে মাছ ধরতে পেরেছি অথবা কখনো একটাও ধরতে পারি নি। আপনার ভাগ্য খুব ভালো। এটা আপনার কারণে সম্ভব হয়েছে।'

সুলতান বললেন : 'না, বৎস! এটা তোমার কারণে সম্ভব হয়েছে। আসল বিষয়টা কপাল বা ভাগ্যের ওপরে নির্ভরশীল ছিলো না। আমি জালটিকে গভীর জলে ফেলেছিলাম, সেখানে মাছ বেশি ছিলো।'

ছেলেটি বললো : 'ঠিক আছে। চলুন, এবার ভাগ করি। অর্ধেক আপনার, অর্ধেক আমার। আমি একটাও বেশি চাই না। যা হবে, খোদা তাতেই বরকত দেবেন।'

সুলতান বললেন : 'না, এভাবে না। আমি যখন কারো সাথে ভাগ করে কোনো কাজ করি তখন এক দিনের জন্য করি। আমি আজকে মাছ ধরার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমি আজকে ঘুরতে এসেছি। তুমি মাছ ধরার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলে। খুব ভালো জায়গা নির্বাচন করেছিলে মাছ ধরার জন্য। আজকে যে মাছ পেয়েছি তা সব তোমার। আগামীকাল যে মাছ পাবো তা সব আমার। এতে তো তোমার কোন সমস্যা নাই। আর এতে তো কাউকে কোন দয়া দেখানো হবে না, তাই না?'

ছেলেটি বললো : 'খুব ভালো কথা। আপনি অন্তত দু' তিনটি মাছ আপনার জন্য নিয়ে যান।'

সুলতান বললেন : 'না লাগবে না। তুমি নিয়ে যাও।'

ছেলেটি বললো : 'ঠিক আছে, এ মাছগুলো দিয়ে আমার পরিবারের ভরণ-পোষণ চলে যাবে। তা হলে আগামী কাল অবশ্যই আমরা একত্রে মাছ ধরায় অংশগ্রহণ করবো।'

সুলতান বললো : 'অবশ্যই। এখন আমি আসি। আগামী কাল পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়ে রাখুন। তা হলে এই কথাই রইলো। খোদা হাফেজ!'

সুলতান ছেলেটিকে হাসিমুখে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ছেলেটি মাছের আড়তে গিয়ে মাছ বিক্রি করলো। পাইকার বললো : 'আজ তো ভালো দাও মেরেছো।' ছেলেটি বললো : 'হ্যাঁ, আজকে খুব ভালো একজনের সাথে ভাগে মাছ ধরেছি। বলা হয়ে থাকে– একত্রে কাজ করলে কাজটা ভলো হয়। কিন্তু আমাকে পুরো মাছ দিয়ে দিয়েছেন। আগামীকাল আর আমি কোন মাছ পাবো না। আগামীকালের সব মাছ আমার সেই সঙ্গীর।'

পরের দিন সকালে সুলতান মাহমুদ প্রাসাদের একজন কর্মচারীকে সমুদ্র তীরে পাঠিয়ে নির্দেশ করলেন : 'যাও, সমুদ্র তীরের অমুক জায়গায় একটি মাছ শিকারি কালো বালক বসে আছে। তাকে গিয়ে বলো যে, তোমার গতকালের মাছ ধরার অংশীদার তোমার জন্য অপেক্ষা করছে এবং ছেলেটিকে সাথে নিয়ে আসো।'

সুলতানের কর্মচারী এসে ছেলেটিকে সুলতানের সংবাদ দিলো। ছেলেটি ভয় পেয়ে গেলো। কিন্তু যখন বুঝতে পারলো সুলতান মাহমুদ ডেকেছেন। তখন নিজে নিজে ভাবলো : 'আমার তো কোনো দোষ নেই। গতকাল আমাদের এক সঙ্গে মাছ ধরা তো দোষের কিছু নয়।' সে জাল গুছিয়ে সুলতান মাহমুদের উপকূলীয় প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছলো।

ছেলেটি ভাবলো, 'আজকে দু'জনে একসঙ্গে মাছ ধরার কথা। সুলতানের সাথে আজ মাছ ধরবো। আজ আমি কোনো মাছ চাই না।' ছেলেটি প্রাসাদে পৌঁছলে সুলতান তাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন : 'গতকাল আমি তোমাকে মাছ ধরার কাজে সাহায্য করেছি। আজ তুমি আমার কাজে সাহায্য করবে। এতে তো দোষের কিছু নেই।'

ছেলেটি বললো : 'না, ঠিক আছে। কথা ছিলো যে, আজ আমরা একসঙ্গে মাছ ধরবো। কিন্তু গতকাল আপনার ভাগ্য ভালো ছিলো। আমি ভয় পাচ্ছি আজকে আমার ভাগ্য কেমন হয়। আপনাকে কী দিতে পারবো ? আসলে আমার ভাগ্যটা খুব একটা ভালো নয়।'

সুলতান বললেন : 'না, প্রিয় বৎস! আসলে এটা ভাগ্যের বিষয় নয়। মানুষের চিন্তা ও কাজের কারণে মানুষ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আমি যদি তোমার মতো ছোট একটা জাল নিয়ে মাছ ধরতাম কিংবা তুমি যদি অন্য কোনো কাজ করতে, এতে কিছু আসে যায় না। দেখো এরা সবাই আমার সহকর্মী। এদের মধ্যে কি কালো মানুষ নেই ? এই একে দেখো, এ দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধবন্দি হিসেবে জীবন কাটিয়েছে। আজ সে আমার সেনাপতি। আমার বাবা জীবনের প্রথম দিকে গোলাম ছিলেন। মানুষ যে কাজই করুক না কেন, তার প্রচেষ্টা ও কর্মদক্ষতা তাকে ঐ কাজে অগ্রসরময় করে দেয় এবং উন্নতি এনে দেয়। এ দুনিয়ার সব কাজই সমান। একেক জন একেক কাজ করছে। যা

হোক আজ আমাদের কথা ছিলো আমরা একসঙ্গে মাছ ধরবো। কিন্তু আমার তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। তুমি আমার মজলিসে বসে থাকো। যে সকল সমস্যা আসবে আমরা দু'জনে মিলে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবো।'

ছেলেটি বললো : 'বেশ ভালো তো। আজকে আমার কথা ছাড়া কোনো কাজ হবে না। তাই তো?'

এ কথা শুনে উপস্থিত সকলে হেসে উঠলো। একজন সভাসদ সুলতানের কাছে এসে আস্তে আস্তে বললেন : 'মাফ করবেন জাঁহাপনা! এ ছেলে এতটা ভালোবাসা পাবার যোগ্য নয়। সে বিষয়টিকে খুব গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। সে আবার ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।'

সুলতান জবাব দিলেন : 'সে ক্ষতির কারণ হবে না। যেহেতু আমি তাকে কথা দিয়েছি, এর নড়চড় হবে না।'

ঐ দিন যে সকল রাজকার্য সম্পাদিত হয়েছে ঐ ছেলেটির সাথে পরামর্শ করেই হয়েছে। ঐ দিনের কাজের পরিমাণ ছিলো অনেক বেশি।

তার মধ্যে একটি কাজ ছিলো এমন যে, সুলতান মাহমুদ একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করতে চাইলেন। এজন্য তিনি বেশ প্রশস্ত জায়গা খরিদ করেছিলেন, কিন্তু এর এক কোণায় এক বৃদ্ধার বসতবাড়ি। ঐ বৃদ্ধা তাঁর ঘর ও জমি বিক্রি করতে রাজি ছিলেন না। ঐ দিন বৃদ্ধা দরবারে এলেন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য। সুলতান বালকের সাথে পরামর্শ করলেন কী করা যায়।

বালকটি বললো : 'এটা একটা পুণ্যের কাজ। এ কাজে বৃদ্ধাকে অসন্তুষ্ট করা উচিত হবে না। হয় অন্য কোনো জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করুন অথবা ঐ বৃদ্ধাকে ঐ মসজিদের অংশীদার করে নিন এবং মসজিদের এক অংশের নাম ঐ বৃদ্ধার নামে নামকরণ করা হোক। এভাবে সমাধান করলে আর কোনো সমস্যা হবে না।'

সুলতান বললেন : 'যদি বৃদ্ধা রাজি হন তা হলে কোনো সমস্যা নেই।'

বৃদ্ধা বললেন : 'আল্লাহকে হাজির জেনে বলছি, আমিও এমনটি চেয়েছিলাম।' এ সমস্যার এভাবে সমাধান হলো বলে বালকটিও খুব খুশি হলো।

এরপর খবর এলো খোরাসানের আমীর বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। সৈন্যবাহিনী জড়ো করেছেন এবং নিজেকে বাদশাহ বলে দাবি করছেন এবং গজনীতে হামলা করতে উদ্যত হয়েছেন।

সুলতান বললেন : 'বৎস! এর কী সমাধান করা যায়?'

বালকটি জবাব দিলো : 'আল্লাহর কসম। আমি জানি না। আপনি তো ভালো কাজ করছেন, আপনার পেরেশানিও অনেক। তাই আমার মনে হয় সন্ধি করে নিলেই বোধ হয় ভালো হয়।'

সুলতান বললেন : 'এটা খুব মুশকিল। এতটা সহজ বিষয় নয়। সন্ধি তখনই হয় যখন উভয় পক্ষ সমান সমান হয় এবং মানুষ লোভের বশবর্তী না হয়। যখন কেউ বলে, সবকিছুই আমার, তখন তার সাথে সন্ধি করা যায় না। যদি গতকাল আমি আমার ভাগের চেয়ে দুটি মাছ বেশি চাইতাম, তা হলে কি তুমি রাজি হতে?'

ছেলেটি বললো : 'জী।'

সুলতান বললেন : 'যদি সব মাছ নিয়ে আসতে চাইতাম, তা হলে ?'

বালকটি বললো : 'এটা করা ঠিক হতো না।'

সুলতান বললেন : 'এটা সে রকমই। যখন জোর করা বা অবাধ্যতার প্রশ্ন আসে তখন প্রতিবাদের জন্য সামনে দাঁড়াতেই হয়।'

ছেলেটি বললো : 'আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন। এমনটি করা যায় না যে, খোরাসানের শাসনভার তাকে দিয়ে আমরা শান্ত থাকবো যেভাবে মাছ ভাগ করে নিয়েছিলাম এবং দুজনই সন্তুষ্ট ছিলাম?'

সুলতান বললেন : 'এটাও সম্ভব নয়। কেননা, সে খোরাসানের শাসক ছিলো। এটাই তার যোগ্য কাজ ছিলো যে, আমাদের পক্ষে সে খোরাসান শাসন করতো। কিন্তু সে নিজের প্রাপ্য নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলো না। এখন সে শুধু খোরাসান নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, সে গজনীতে হামলা করতে উদ্যত হয়েছে। খোরাসান পেয়ে লোভ বেড়ে গেছে। এখন তাকে যদি খোরাসান দিয়ে দেই তাহলে কালকে সে বাল্‌খ (সুলতান মাহমুদের শাসনাধীন একটি অঞ্চল) চাইবে। এরপর ইরাক, তারপর তাবারিস্তান। আর সব জায়গা থেকে যদি হাত গুটিয়ে নেই, তা হলে আমাদের হাতে আর শাসনক্ষমতা থাকবে না। সর্বত্র দাঙ্গা, গোলযোগ বিরাজ করবে। মানুষ বিপদে নিপতিত হবে। তা হলে সুলতান মাহমুদ বেঁচে থেকে আর লাভটা কী ?'

ছেলেটি বললো : 'আমাদের দু'জনের তো তা হলে আর কোনো কাজ থাকবে না।'

উপস্থিত সকলে হেসে উঠলো এবং বললো : 'দেখেছো তোমার এখানে কোনো অবস্থান নেই, অথচ তুমি অসন্তুষ্ট হলে?'

ছেলেটি বললো : 'না, আসলে বিষয়টি খুব জটিল। আমার মাথায় ঢুকছে না। তা হলে কি খোরাসানের শাসককে জেলে পুরে দেবো?'

সুলতান বললেন : 'না, এত তাড়াতাড়ি না। কাজটা এত সহজ নয়। সে আমাদের মজলিসে হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। দেখো সে এমন একজন ব্যক্তি যে খোরাসানসহ অন্যান্য জায়গার কর্তৃত্ব পেতে চায়। যদি তাকে একা করে দেয়া যায় তা হলে আর সে গজনীতে হামলা করার সাহস করবে না। তার কাছে সৈন্যবাহিনী আছে যারা তাকে সাহায্য করবে, কিন্তু তারা খোরাসান চায় না। তারা তাদের শাসকের মধ্যে এমন কোনো গুণ দেখেছে যাতে তারা তার সঙ্গ দিতে চায়। তা হলে প্রথমে আমাদেরকে দেখতে হবে সেই জিনিসটা কী, যাতে সবাই তার আনুগত্য স্বীকার করে। সেটা কি ন্যায়বিচার, নাকি সুন্দর ব্যবহার? মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা, না বুদ্ধিমত্তা। নাকি তার কৌশল, না অন্য কিছু? প্রথমে আমরা সেটা জানবো এবং সেই বৈশিষ্ট্যটা আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি করবো। এরপর তার মুখোমুখি হবো। যদি সে আত্মসমর্পণ করে এবং ভুল স্বীকার করে তা হলে তাকে ক্ষমা করবো আর যদি যুদ্ধ করতে চায় তা হলে তাকে পরাজিত না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করবো। এ কাজের জন্য চিন্তা, জ্ঞান, রসদ এবং সহযোগিতা প্রয়োজন। কীভাবে এটা শুরু করা যায় ?'

ছেলেটি বলেলো : 'আপনি ঠিকই বলেছেন। কখনো কখনো ক্ষমা করাও অন্যায়। কিন্তু এ কাজের হিসাবটা অনেক জটিল। মাছ ধরার মতো সহজ নয়। এ কাজে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নাই। যদি একা থাকতাম তা হলে কিছুই বুঝতে পারতাম না। এটা খুব ভালো হলো যে, আমরা একসঙ্গে আছি।'

সুলতান ও তাঁর অমাত্যগণ হেসে উঠলেন। সুলতানের অমাত্যগণ এটা স্বীকার করলেন যে, ছেলেটা খুব বুদ্ধিমান এবং সে ন্যায় বিচার পছন্দ করে।

সুলতান এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশনা দিলেন এবং ঐ দিন দরবারের আরো কিছু কাজ করে দিনের কাজ-কর্ম সমাপ্ত করলেন। সন্ধ্যার সময় মাছ শিকারি বালকটি বললো : 'আমার সময় শেষ। প্রতিদিন সন্ধ্যা হয়ে গেলে আর কোনো কাজ করি না। এখন আমার মা ও ভাই-বোনরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

সুলতান বললেন : 'বেশ তো। গতকাল এবং আজ আমরা একসঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কাজের মধ্যে পার্থক্য ছিলো। আজ আমরা গতকালের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করেছি। তাই তোমার যতটা মন চায় কোষাগার থেকে অর্থকড়ি নিয়ে যেতে পারো। অনেক অনেক মুদ্রা নিতে পারো। কত মুদ্রা নিতে চাও?'

ছেলেটি বললো : 'আমি কিছুই চাই না। আমাদের কথা ছিলো একদিনের আয় আমার, একদিনের আয় আপনার। আজকের দিনের যা কিছু অর্জন তা তো আপনার। এতে আমার কোনো অধিকার নেই। আপনি দুটি মাছও নিতে চান নি। আমিও আজ কোনো কিছু নিতে রাজি নই। তা হলেই হিসাব সমান সমান।'

সুলতান মাহমুদ বললেন : 'না, হিসাব সমান হলো না। গতকাল আমরা দু'ঘণ্টা কাজ করেছিলাম। আর আজ অনেক বেশি। তাই হিসাব সমান হয় নি। তুমি যে পরিমাণ চাও, অতিরিক্ত সময়ের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করো।'

ছেলেটা বললো : 'যদি তাই হয়, তা হলে আমি কিছু মাছ চাই। তা হলে আমি আগামীকাল খেলার সুযোগ পাবো।'

ঠিক তাই করা হলো। তার জন্য বেশ কিছু মাছ এনে দেয়া হলো। তখন বালকটি বললো : 'বেশ। আগামী কাল আবার কাজের সময়। যদি আবারো একসঙ্গে কাজ করতে চান চলে আসবেন।'

সুলতান বললেন : 'দেখলে তো আমার কত কাজ! আমাকে একাজ নিয়ে পড়ে থাকতে হয়। যদি তুমি চাও তা হলে এখানে চলে এসো, এক সঙ্গে কাজ করবো।'

ছেলেটি বললো : 'না, আমার মন সমুদ্রে পড়ে আছে। আমি সমুদ্রে কাজ করার ব্যাপারে অংশীদার হতে চাইলে রাজি আছি। আপনি লোকজনের এত কাজ রেখে আসতে পারবেন না। কেননা, এখানে মানুষের অধিকারের বিষয় জড়িত।'

সুলতান বললেন : 'বেশ তো। যদি কোন প্রয়োজন হয় এখানে চলে এসো। আমি এখানেই আছি।'

ছেলেটি বললো : 'ধন্যবাদ। যদি প্রতিদিন আমার জালে গতকালের মতো মাছ ধরা পড়ে তা হলে আমার আর কোন চাহিদাই থাকবে না। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আমি আনন্দিত এবং আপনার কাজ আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার কাজ মাছ ধরা। এখন আপনার দয়ায় জানতে পারলাম কী ভাবে বেশি মাছ ধরতে হয়।'

ছেলেটি সুলতানকে বিদায় জানিয়ে মাছ নিয়ে সন্তুষ্ট মনে ঘরে ফিরলো। সুলতান মাহমুদ ছেলেটির সংসারে সাহায্য করলেন। ছেলেটিকে সমুদ্রের ভালোবাসা থেকে দূরে না সরিয়ে তাকে একটি মাছ ধরার নৌকা উপহার দিলেন।

রোহান আমার ভাই

মুহাম্মদ ইসমাইল

বায়েজীদ, বাবা উঠ্। উঠ্ তো; আর কতক্ষণ ঘুমাবি? ফজরের আজান হয়ে গেছে। মসজিদে নামাজ পড়তে যা। তোর আব্বু চলে গেছেন। তাড়াতাড়ি কর।

বায়েজীদ নামাজ শেষে কুরআন তিলাওয়াত করে অর্থসহ। তারপর প্রায়ই হাদীসের বই পড়ে। এরপর ক্লাসের পড়া পড়তে বসে। মা বললেন, তোর নাসতা টেবিলে দিছি। নাসতা খেয়ে স্কুলে যা। বায়েজীদ বললো, মা আমাদের আজকের মাস্টার একদম ভালো না। আজকে স্কুলে যাবো না। মা বললেন, বাবা, কখনো স্কুল বন্ধ করবি না। যারা নিয়মিত স্কুলে যায় তাদের সময় মতো লেখাপড়া করতে সুবিধা হয়। স্মরণে থাকে।

বাবা অফিস যাওয়ার সময় বায়েজীদকে নিয়ে স্কুলে চলে যান। বাবা চাকরী করেন মতিঝিলে। বায়েজীদ লেখাপড়া করে মতিঝিলের স্কুলে। ওখানে নিয়ম-কানুনগুলো সব অভিভাবকের ভালো লাগে। মেয়েরা শালীন পোশাকে মাথায় স্কার্ফ পরে ক্লাসে যায়। মেয়েদের ক্লাস আলাদা, ছেলেদের ক্লাস আলাদা। দুপুরে মসজিদে আজানের পর নামাজের বিরতি। ছেলেরা পাশের মসজিদে নামাজ আদায় করে। মেয়েদের জন্য নামাজের ব্যবস্থা আছে।

নামাজের পরে দুপুরের খাওয়ার পালা। যে যা বাসা থেকে নিয়ে এসেছে তাই নিয়ে খেতে বসে পড়ে। বায়েজীদের এক চাচাতো ভাই রোহান। সে সব সময় নামাজের পর ক্লাসে চলে যায়। ক্লাসে বই পড়ে ঢক ঢক করে এক বোতল পানি পান করে বসে পড়াশুনা করে। বায়েজীদ সব সময় ওর এই অবস্থা দেখে মাকে ঘটনা খুলে বলল। মা, আমি তো অনেক কিছু খাই, দেখি, পড়ি। রোহানরা গরীব। এসব কিছুই সে ভোগ করতে পারে না। রোহানও মেধাবী। কয়েক বছর আগে তার বাবা মারা গিয়েছেন। সংসারে আয়ের উৎস একমাত্র তার মা। মা আর এক বোন ছাড়া আর কেউই নেই। ওর বাবার ইচ্ছে ছিল রোহান ডাক্তার হবে। কিন্তু বাবা দেখে যেতে পারলেন না। তা মা ছোটখাটো একটা চাকরী করে সংসার চালায়। ছোট বোনটিও পড়ে। সংসারে যা যা দরকার তা কখনো ঠিকমত দিতে পারে না। রোহান ও এমন ছেলে, মুখ দিয়ে নিজের দুঃখের কথা কাউকে বলে না। নিজের দুঃখ নিজের মনেই চেপে রাখে।

বায়েজীদ এবার তার মাকে বলল, মা তুমি আমাকে দুপুরের টিফিন ডবল করে দিও। আমি রোহানসহ এক সাথে খাবো। রোহান আমার আপন ভাই না হলে কি হবে? আমরা তো সবাই ভাই ভাই। সে বাসা থেকে খাওয়া আনার পর রোহানকে তা থেকে খেতে দিল। রোহান খায় না। অনেক বুঝানোর পর রোহান ও বায়েজীদ এক সাথে দুপুরের টিফিন খায়। তারা এক মায়ের সন্তানের মত পথ চলা শুরু করলো। পরীক্ষা দিল। পরীক্ষার ফল অনেক ভালো করেছে দুজনই। রোহান বায়েজীদের বাসায় যায় আর বায়জীদও রোহানের বাসায় যায়। তাদের লক্ষ্য একটাই, তারা মানুষের মতো মানুষ হবে। সমাজের সেবা করবে। মানবতার কাজে এগিয়ে যাবে। তাদের পথ চলা দেখে দু'জনেরই মা বেজায় খুশি।